স্বাস্থ্য সংলাপ

icddr,b

কালাজ্বর

চৌধুরী মোঃ গালিব, আইসিডিডিআর,বি

কালাজ্বর একটি পরজীবীঘটিত রোগের নাম যা সারাবিশ্বে ম্যালেরিয়ার পরেই সবচেয়ে প্রাণঘাতী। এর নাম মূলত ভিসেরাল লিশমেনিয়াসিস। কিন্তু এই উপমহাদেশে তথা দক্ষিণ এশিয়ায় এটি কালাজ্বর নামে বহুল পরিচিত। কালাজ্বরের নাম শুনলেই দু'টি শব্দ প্রথম মনের মধ্যে ভেসে ওঠে। শব্দ দু'টি হলো 'কালো' এবং 'জ্বর'। আমরা সবাই জানি যে, জ্বর হলে দেহের তাপমাত্রা বেড়ে যায়। কালাজ্বরের ক্ষেত্রে দেহের তাপমাত্রা বাড়া ছাড়াও রোগীর গায়ের রঙ একটু কালো হয় বলে এ-রোগের নাম কালাজ্বর রাখা হয় এবং মূলত ভারতে এই নামকরণ করা হয়। তবে, ত্বক কালো করা ছাড়াও কালাজ্বরের অন্যান্য বৈশিষ্ট্য রয়েছে যা এ-লেখার পরবর্তী অংশে আলোচিত হয়েছে।

সারাবিশ্বে প্রতিবছর প্রায় ৫ লক্ষ মানুষ কালাজ্বরে আক্রান্ত হয় এবং প্রায় ২০-৪০ হাজার মানুষ মারা যায়। বাংলাদেশে এ-রোগ উনিশ শতকের প্রথমদিকে দেখা দিলেও ১৯৬০ সালের ব্যাপক ম্যালেরিয়া নিয়ন্ত্রণ কর্মসূচির সময় কালাজ্বরও অনেকটাই কমে যায়। কিন্তু ১৯৮০ সালের পর তা আবারও দেখা দেয়। বাংলাদেশে অনেক জেলাতেই এ-রোগ দেখা গেলেও সবখানে তা ব্যাপক নয়। শুধুমাত্র ময়মনসিংহ জেলার ত্রিশাল ও ফুলবাড়ী এলাকায় এ-রোগ ব্যাপক হারে দেখা যায়।

কালাজ্বর কীভাবে ছড়ায়

মূলত বেলেমাছির দ্বারা কালাজ্বর একজন থেকে অন্যজনে ছড়ায়। বেলেমাছি কালাজ্বরের জীবাণুবাহক (যাকে ইংরেজিতে সংক্ষেপে পিকেডিএল বলা হয়ে থাকে) একজন মানুষকে কামড়ানোর পর একজন সুস্থ মানুষকে কামড়ালে ওই সুস্থ মানুষের দেহে এ-রোগের জীবাণু প্রবেশ করে এবং সেও এ-রোগে আক্রান্ত হতে পারে।

বেলেমাছি কী, এরা কোথায় থাকে এবং দেখতে কেমন? বেলেমাছি একটি ছোট জাতের মাছি যা একটি মশার চেয়েও ছোট এবং অনেকে এটিকে মশা ভেবে ভুলও করে। এটি দেখতে সাধারণত মাছির মতো নয় এবং এ-মাছি গ্রামাঞ্চলে ঝোপ-ঝাড় এবং মাটি দিয়ে তৈরি বাড়ির ফাটলের ফাঁকে লুকিয়ে থাকে। একমাত্র মেয়ে-মাছিরাই রক্ত খাওয়ার জন্য কামড়ায়, কারণ রক্ত তাদের ডিম দিতে সহায়তা করে। এরা দৈর্ঘ্যে মাত্র ৩ মিলিমিটার হয়ে থাকে।

কালাজ্বরের লক্ষণ

কালাজ্বরের লক্ষণ কিছুটা ম্যালেরিয়ার মতো। এ-রোগে মাত্রাতিরিক্ত জ্বর দু'সপ্তাহ পর্যন্ত থাকে। এই দীর্ঘ সময়ের জ্বরে রোগী অত্যন্ত দুর্বল হয়ে পড়ে এবং গায়ের রঙ কিছুটা কালো হয়ে যায়। তবে সবচাইতে গুরুত্বপূর্ণ লক্ষণ হলো এ-রোগে রোগীর প্লীহা ফুলে যায় যা অনুভব করা যায় পেটের একটু নিচের দিকে নাভীর বামপাশে হাত রেখে। প্রশিক্ষিত চিকিৎসক বা স্বাস্থ্যকর্মী সহজেই তা অনুভব করতে পারেন।

এছাড়াও, এ-রোগের ফলে মাথা-ঘোরা এবং শরীরে মৃদু কাঁপুনি দেখা দিতে পারে। তবে, স্বাস্থ্যকর্মী রোগটি সম্পর্কে সঠিকভাবে না-জানলে বা রোগী দেখতে অবহেলা করলে রোগ সনাক্তকরণে ভুল হতে পারে এবং অন্য ধরনের জ্বর ভেবে চিকিৎসা দিতে পারেন, যার ফলে রোগীর বড় ধরনের ক্ষতি হতে পারে, এমনকি রোগী মারাও যেতে পারে।

বেলেমাছি

ভেতরের পাতায়

- টিনিয়াসিস (ফিতাকৃমি)
- চোখে অঞ্জনি হলে এবং চোখ উঠলে কী করবেন
- নন-অ্যালকোহলিক ফ্যাটি লিভার ডিজিজ

বর্ষ ২২ | সংখ্যা ৩

চৈত্র ১৪২০ | এপ্রিল ২০১৪

ISSN 1021-2078

icddr,b

আইসিডিডিআর,বি উন্নয়নশীল বিশ্বের সর্ববৃহৎ স্বাস্থ্য গবেষণা প্রতিষ্ঠান। কলেরাসহ ডায়রিয়াজাতীয় রোগের ওপর গবেষণা, এর প্রতিকার ও প্রতিরোধের লক্ষ্যে ১৯৬০ সালে পাক-সিয়াটো কলেরা রিসার্চ ল্যাবরেটরি নামে ঢাকার মহাখালিতে যে-প্রতিষ্ঠান জন্মলাভ করে, মূলত সে-প্রতিষ্ঠানই ১৯৭৮ সালে আন্তর্জাতিকীকরণের মাধ্যমে তার বর্তমান নাম ধারণ করে। এ-প্রতিষ্ঠানের গবেষণা ও সেবাদান-সংক্রান্ত কর্মপরিধি এখন আর কেবল ডায়রিয়াজাতীয় রোগের মধ্যে সীমাবদ্ধ নয়। শিশু-স্বাস্থ্য, প্রজনন-স্বাস্থ্য, পুষ্টি বিজ্ঞান, সংক্রামক ব্যাধি ও টিকাবিষয়ক বিজ্ঞান, ক্রনিক ও অসংক্রামক রোগ, এইচআইভি/এইডস, স্বাস্থ্যের ওপর দারিদ্র্যের প্রভাব, স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা-বিষয়ক কর্মকাঠামো, জেন্ডার স্বাস্থ্য ও মানবাধিকার আইসিডিডিআর,বি-র গবেষণা কর্মসূচিতে অন্তর্ভুক্ত হয়েছে। ডায়রিয়া রোগীর জীবন রক্ষাকারী খাবার স্যালাইনের আবিষ্কার ও উন্নতমানের স্বাস্থ্য-সংক্রান্ত গবেষণার জন্য আইসিডিডিআর,বি পৃথিবী বিখ্যাত।

স্বাস্থ্য সংলাপ

সম্পাদনা পরিষদ

প্রধান সম্পাদক	জন ক্লিমেন্স
উপ-প্রধান সম্পাদক	প্রদীপ কুমার বর্ধন
ব্যবস্থাপনা সম্পাদক	মোঃ সিরাজুল ইসলাম মোল্লা
সম্পাদক	সৈয়দ হাসিবুল হাসান

সদস্য

রুখসানা গাজী, মোঃ ইকবাল, মাসুমা আক্তার খানম, রুবহানা রকিব ও মাখদুম আহমেদ

সহযোগিতায়	হামিদা আক্তার
পৃষ্ঠাবিন্যাস	সৈয়দ হাসিবুল হাসান

কারা স্বাস্থ্য সংলাপ পেতে পারেন

যেকোনো পর্যায়ের স্বাস্থ্যকর্মী, পল্লী-চিকিৎসক, সমাজ উন্নয়নে নিয়োজিত সমিতি, বেসরকারি প্রতিষ্ঠান ও শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের গ্রন্থাগারসমূহে বিনামূল্যে স্বাস্থ্য সংলাপ পাঠানো হয়। স্বাস্থ্যকর্মী হলে আপনার নাম, পদবী ও প্রতিষ্ঠান এবং পূর্ণ ঠিকানা সম্পাদক বরাবর ডাকযোগে বা ইমেইল-এর মাধ্যমে লিখে পাঠান। সমাজ উন্নয়নে নিয়োজিত সমিতি ও বেসরকারি প্রতিষ্ঠানের ক্ষেত্রে অবশ্যই সীলমোহরযুক্ত দাপ্তরিক প্যাডে আবেদন করতে হবে।

প্রকাশক

আইসিডিডিআর,বি
মহাখালি, ঢাকা ১২১২
(জিপিও বক্স ১২৮, ঢাকা ১০০০), বাংলাদেশ
ফোন: (৮৮০২) ৮৮২২৪৬৭, ৯৮২৭০০১-১০
ফ্যাক্স: (৮৮০২) ৮৮১৯১৩৩, ৮৮২৩১১৬
ইমেইল: hasib@icddrb.org

কোনো লেখায় ব্যক্ত মতামতের জন্য প্রকাশক বা সম্পাদকমণ্ডলী দায়ী নন

মুদ্রণ: প্রিন্টলিঙ্ক প্রিন্টার্স, ঢাকা

রোগনির্ণয়

কালাজ্বরের অনেক আধুনিক রোগনির্ণয় পদ্ধতি এখন সারাবিশ্বে চালু আছে। বাংলাদেশ সরকারও কালাজ্বর-প্রবণ এলাকাতে সরকারি হাসপাতালসমূহে এ-রোগের সনাক্তকরণ কিট সরবরাহ করছে। কালাজ্বর রোগের সনাতনী নির্ণয় পদ্ধতিগুলো অনেক জটিল এবং বিশেষ দক্ষ স্বাস্থ্যকর্মী ছাড়া রোগনির্ণয় করাটা ঝুকিপূর্ণ। সনাতনী পদ্ধতিতে প্লীহা থেকে সুই-এর মাধ্যমে প্লীহারস নিয়ে সেটিকে অণুবীক্ষণ যন্ত্রে রেখে জীবাণু সনাক্ত করা হয়ে থাকে। অপরদিকে, আধুনিক পদ্ধতিটির নাম rK39। হাতের আঙুল থেকে এক ফোঁটা রক্ত নিয়ে rK39 কিট-এর ডগায় দিয়ে তার সাথে এক ফোঁটা সরবরাহকৃত মিশ্রণ মিশিয়ে দিলে ২ থেকে ৫ মিনিটের মধ্যেই ফলাফল দেখা যাবে। এছাড়াও, এ-রোগ নির্ণয়ে অন্যান্য পদ্ধতি ব্যবহার করা যায়। তবে, rK39-ই সবচেয়ে জনপ্রিয় এবং সহজ একটি পদ্ধতি। ময়মনসিংহে অনেক গবেষক এসব পদ্ধতি নিয়ে গবেষণা করেছেন এবং এখনও করছেন।

চিকিৎসা

কালাজ্বরের চিকিৎসা অত্যন্ত সময়সাপেক্ষ। কালাজ্বর গ্রামাঞ্চলের দরিদ্র জনগোষ্ঠীর মধ্যে বেশি দেখা যায় এবং চিকিৎসার ক্ষেত্রে অনেকসময় দীর্ঘসুত্রিতা দেখা যায়, যা অনেকগুলো নতুন সমস্যার সৃষ্টি করে। সনাতনী পদ্ধতিতে sodium antimony gluconate (SAG) নামক একটি ইনজেকশনের সাহায্যে মূলত এ-রোগের চিকিৎসা করা হয়। রোগীর শরীরের ওজনের প্রতিকেজিতে ২০ মিলিগ্রাম হিসাব করে সেই পরিমাণ ওষুধ প্রতিদিন পশ্চাদ্দেশের মাংসে প্রয়োগ করা হয়। একদিকের পশ্চাদ্দেশে একদিন ওষুধ প্রয়োগ করা হলে পরদিন অপরদিকের পশ্চাদ্দেশে দিতে হয়। এভাবে ২৮ দিন চিকিৎসা নিতে হয়। গ্রামের সাধারণ দরিদ্র মানুষের জন্য ২৮ দিনের এই দীর্ঘ চিকিৎসা বেশ সমস্যাজনক, কারণ চিকিৎসা নিতে তাদের ২৮ দিন হাসপাতালে (উপজেলা বা জেলা সদর হাসপাতালে) ভর্তি হয়ে থাকতে হয়।

তবে, সারাবিশ্বে কালাজ্বরের চিকিৎসা সহজীকরণের জন্য গবেষণা হচ্ছে। কোনো কোনো ক্ষেত্রে গবেষণাকর্ম অনেকটা এগিয়েও গেছে। আশা করি অদূর ভবিষ্যতে কালাজ্বরের চিকিৎসা-পদ্ধতি আরো উন্নত হবে এবং কালাজ্বরে আক্রান্ত রোগীরা তার সুফল পাবে।

প্রতিরোধ

কালাজ্বর-উপদ্রুত এলাকার মানুষ এ-রোগ প্রতিরোধের জন্য কয়েকটি সাধারণ পদক্ষেপ অবলম্বন করতে পারে:

- মাটির ঘরের ফাটলে বেলেমাছি লুকিয়ে থাকে। যারা মাটির ঘরে বসবাস করে তাদের উচিত সবসময় মাটি লেপে রাখা যাতে ঘরে ফাটলের সৃষ্টি হতে না পারে
- আশপাশের ঝোপ-ঝাড় ছেঁটে সবসময় বসতবাড়ি পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন রাখা
- দিন ও রাত উভয় সময়ে মশারি খাটিয়ে ঘুমানো

কালাজ্বরে আক্রান্ত একটি শিশু

পিকেডিএল

Post-kala-azar dermal leishmaniasis বা পিকেডিএল হলো কালাজ্বর-পরবর্তী রোগীর একটি অবস্থা যখন রোগীর দেহের বিভিন্ন স্থানে ত্বক বিবর্ণ হয়ে যায় এবং আস্তে আস্তে ফুলে ওঠে। এতে রোগী কোনো ব্যথা অনুভব করে না, কোনো চুলকানি হয় না বা জ্বালাপোড়াও হয় না। তবে, এধরনের রোগীরা অন্যদের স্বাস্থ্যের জন্য হুমকিস্বরূপ, কারণ এরা কালাজ্বরের জীবাণুর বাহক। এদের কাছ থেকে বেলেমাছির মাধ্যমে

পিকেডিএল-এর রোগীর ত্বক এভাবে ফুলে ওঠে

কালাজ্বরের জীবাণু অন্যদের শরীরে প্রবেশ করে। এই উপমহাদেশে সাধারণত ১০% কালাজ্বরের রোগীর মুখে চিকিৎসার একবছর পর ফোঁটা-ফোঁটা দাগ দেখা দেয়, যা পরবর্তীতে সারামুখে ও দেহে ছড়িয়ে পড়ে। পিকেডিএল রোগীদের ওইসব ফোঁটা-ফোঁটা বিবর্ণ স্থানে কোনো চুলকানি, ব্যথা, জ্বালা-যন্ত্রণা হয় না। ফলে, রোগী নিজেকে রোগী মনে করে না এবং তারা চিকিৎসা নেওয়ার কোনো প্রয়োজনীয়তা অনুভব করে না। এই মানসিকতা এই রোগ নির্মূলের ক্ষেত্রে একটি বড় অন্তরায়। এই রোগের আরো একটি বড় সমস্যা হলো এখনো এ-রোগ নির্ণয়ের জন্য নির্ভরযোগ্য পদ্ধতির অভাব রয়েছে।

পিকেডিএল-এর সাথে কুষ্ঠরোগের খুব মিল থাকায় এটিকে অনেকে কুষ্ঠরোগ বলে মনে করে। কিন্তু কুষ্ঠরোগের সাথে এর প্রধান পার্থক্য হলো অনুভূতির উপস্থিতি। কুষ্ঠরোগীদের দেহের বিবর্ণ অংশে একটি পালক ছোঁয়ালে কোনো অনুভূতি হয় না, তবে পিকেডিএল-এর রোগীরা তা টের পায়। অপরদিকে, পিকেডিএল-এর এসব দাগ পরবর্তীতে আস্তে আস্তে ফুলে যায় এবং স্পর্শে ফোলাটা অনুভব করা যায়। পিকেডিএল-এর চিকিৎসা অনেক দীর্ঘ। এ-রোগ নিরাময়ের জন্য কালাজ্বরের মতই একই ওষুধ একই পদ্ধতিতে প্রয়োগ করা হয়। তবে, এক্ষেত্রে রোগীকে ৬ মাস ধরে চিকিৎসা নিতে হয়, অর্থাৎ প্রতিমাসে ২০ দিন করে ৬ মাসে ১২০ দিন রোগীকে ইনজেকশন নিতে হয়। এতে রোগী কোনোপ্রকার অসুবিধা বোধ করে না, কারণ কোনো ব্যথা, চুলকানি বা জ্বালা-যন্ত্রণা হয় না। তবে, এর চিকিৎসা অতি দীর্ঘ বলে রোগীরা চিকিৎসা নিতে আগ্রহ বোধ করে না। পিকেডিএল রোগীরা কালাজ্বর রোগ নির্মূলের ক্ষেত্রে একটি অন্তরায়। এ-রোগ নির্মূল করতে হলে জনগণকে পিকেডিএল এবং বেলেমাছি সম্পর্কে জানাতে হবে, কারণ পিকেডিএল রোগীকে বেলেমাছি কামড়িয়ে অপর একজনকে কামড়ালে তার কালাজ্বর হওয়ার সম্ভাবনা অনেক। এক্ষেত্রে বলে রাখা ভালো যে, অনেক স্বাস্থ্যবান মানুষের দেহে কালাজ্বরের জীবাণু প্রবেশ করলেও রোগ প্রকাশ না-ও পেতে পারে। একে অপ্রকাশিত বা লক্ষণহীন (asymptomatic) কালাজ্বর বলা হয়ে থাকে।

অপ্রকাশিত বা লক্ষণহীন কালাজ্বর

কালাজ্বরের জীবাণু বেলেমাছির দ্বারা রক্তের মাধ্যমে দেহে প্রবেশ করলেও সবার মধ্যে রোগ প্রকাশ পায় না। কেন প্রকাশ পায় না তার উত্তরে অনেকের গবেষণায় অনেক ধরনের ব্যাখ্যা উঠে এসেছে, যেমন সামাজিক অবস্থান, পুষ্টি, কালাজ্বরের জীবাণুর সংখ্যা, ইত্যাদি। গবেষণায় অপ্রকাশিত ও প্রকাশিত কালাজ্বরের অনুপাত কোথাও ১:৬ বা কোথাও ১:৫০ পাওয়া গেছে। অপ্রকাশিত কালাজ্বর রোগীর সক্রিয় কালাজ্বর হতে পারে যদি সেই রোগী শারীরিকভাবে দুর্বল হয়ে পড়ে। অপ্রকাশিত কালাজ্বরের বাহকদের দ্বারা কালাজ্বর ছড়ায় কি না এ-ব্যাপারে যথেষ্ট সন্দেহ রয়েছে। কিন্তু তারা ঝুঁকিতে আছেন এ-কথা বলা যায়, কারণ যেকোনো মুহূর্তে তাদের রোগ প্রকাশ পেতে পারে। কালাজ্বর নিয়ন্ত্রণ করতে তাই এসব রোগীকেও গুরুত্বের সাথে দেখা দরকার এবং এ-বিষয়ে আরো গবেষণার প্রয়োজন রয়েছে। ■

টিনিয়াসিস (ফিতাকৃমি)

ডাঃ মোঃ ফজলুল কবির পাভেল, পাবনা মেডিকেল কলেজ

টিনিয়াসিস রোগটি সারা বিশ্বেই কমবেশি দেখা যায়। একজাতীয় পরজীবী কৃমি এই রোগের জন্য দায়ী। সাধারণত দুই ধরনের পরজীবীর মাধ্যমে টিনিয়াসিস হয়ে থাকে। এদের নাম হলো *টিনিয়া সোলিয়াম* এবং *টিনিয়া স্যাজিনেটা*। *টিনিয়া সোলিয়াম* বহনকারী প্রাণী হচ্ছে শুকর আর *টিনিয়া স্যাজিনেটা* বহনকারী প্রাণী হচ্ছে গরু। এ-দু'টি পরজীবী দেখতে একই রকম এবং এদের জীবনচক্রও প্রায় একই ধরনের। *টিনিয়া সোলিয়াম* বেশি দেখা যায় মধ্য ইউরোপ, দক্ষিণ আফ্রিকা, দক্ষিণ আমেরিকা এবং এশিয়ার কিছু

টিনিয়া পরজীবী

টিনিয়া-র জীবনচক্র

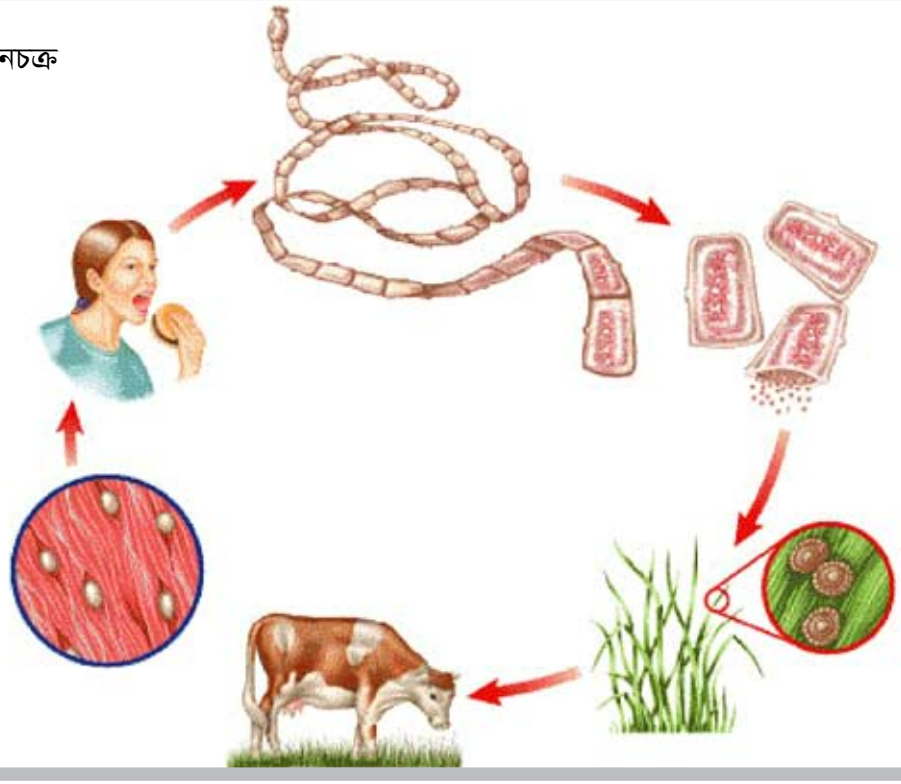

অংশে আর *টিনিয়া স্যাজিনেটা* বেশি দেখা যায় দক্ষিণ এশিয়া, ভূমধ্যসাগরীয় অঞ্চল এবং সাহারা মরুভূমির দক্ষিণের দেশসমূহে। মুসলমান-অধ্যুষিত দেশসমূহে *টিনিয়া সোলিয়াম* তেমন দেখা যায় না, কারণ মুসলমানেরা শুকরের মাংস খায় না।

প্রাণীজগতে ১০টি পর্ব আছে। এর মধ্যে প্লাটি-হেলমিনথিস একটি পর্ব। *টিনিয়া* পরজীবীরা এই পর্বের মধ্যে পড়ে। এরা বৃহত্তম পরজীবী, যা দৈর্ঘ্যে ১২ ফুট পর্যন্ত হতে পারে। *টিনিয়া* পরজীবীর মাথা মোটা এবং দেহ খণ্ডায়িত। প্রতিটি খণ্ড ডিম তৈরি করে। *টিনিয়া* পরজীবী বহন করছে এমন গরু বা শুকরের মাংসে কৃমির বাচ্চা বা লার্ভা থাকে। এসব গরু বা শুকরের মাংস ভালোভাবে সিদ্ধ না-করা হলে লার্ভা মরে না। কৃমির লার্ভা আছে এমন মাংস অসিদ্ধ বা অর্ধসিদ্ধ অবস্থায় কোনো মানুষ গ্রহণ করলে লার্ভা তার অন্ত্রে চলে যায় এবং সে টিনিয়াসিসে আক্রান্ত হয়। সময়ের সাথে সাথে এই লার্ভা পূর্ণ কৃমিতে পরিণত হয় এবং ডিম পাড়ে। আক্রান্ত ব্যক্তির মলের সাথে কৃমির ডিম বাইরে এসে পরিবেশে ছড়িয়ে পড়ে। পরবর্তীতে সেই পরিবেশে জন্মানো ঘাস বা লতাপাতা খেয়ে গরু বা শুকর যখন ডিমটি গ্রহণ করে তখন সেটি তাদের অন্ত্রে চলে যায়। এরপর লার্ভা বের হয়ে অন্ত্রের দেওয়াল ভেদ করে রক্ত অথবা লসিকানালীর মাধ্যমে মাংসপেশীতে চলে যায়। এভাবে আবার যখন কোনো মানুষ সেই গরু বা শুকরের মাংস ভালোভাবে সিদ্ধ না-করে খায় তখন সে টিনিয়াসিসে আক্রান্ত হয়।

টিনিয়াসিসে আক্রান্ত হলে তেমন কোনো উপসর্গ বোঝা যায় না। এই রোগ নীরবে ক্ষতি করে। কেউ কেউ পেটে অস্বস্তি বা ব্যথার কথা বলে। অনেকের দীর্ঘদিন ধরে বদহজম দেখা দিতে পারে। তবে, অনেক সময় পায়খানার সাথে কৃমির অংশ নির্গত হয়, যা দেখে *টিনিয়া*-র অস্তিত্ব ধরা যায়। *টিনিয়া* আক্রান্ত ব্যক্তির পুষ্টিতে ভাগ বসায় এবং দীর্ঘদিন শরীরে থেকে অনেক ক্ষতি করে। আক্রান্ত ব্যক্তি মারাত্মক অপুষ্টিতে ভোগে এবং ক্রমেই শুকিয়ে যেতে থাকে। শিশুদের ক্ষেত্রে টিনিয়াসিস মস্তিষ্কে মারাত্মক সংক্রমণ ঘটাতে পারে।

টিনিয়াসিস রোগ নির্ণয় করা সহজ। আক্রান্ত ব্যক্তির মল পরীক্ষা করলে *টিনিয়া সোলিয়াম* বা *টিনিয়া স্যাজিনেটা*র ডিম সনাক্ত করা যায়। অনেকসময় *টিনিয়া*-র সেগমেন্ট বা খণ্ডও দেখা যায়। রক্ত পরীক্ষা করলে ইসোনোফিল বেশি পাওয়া যায়। কিছুকিছু ক্ষেত্রে কৃমি থেকে সিস্ট হয়ে ক্যালসিফাইড হয়ে যায়। তখন এক্সরে বা সিটি স্ক্যানের প্রয়োজন হতে পারে। তবে, সাধারণত এসব পরীক্ষার দরকার পড়ে না।

টিনিয়াসিসের ভালো চিকিৎসা আছে। প্রাজিকুয়ান্ট্যাল নামের একটি ওষুধ এ-রোগে ভালো কাজ করে। এছাড়াও, এলবেনডাজল এবং নিকলোসোমাইড ওষুধও ব্যবহার করা হয়ে থাকে। কার জন্য কোন ওষুধ উপযুক্ত তা একজন চিকিৎসকই ঠিক করবেন। মস্তিষ্কে সংক্রমণ হলে খিঁচুনি দূর করার জন্য ওষুধ দেওয়া হয়। অনেক সময় টিনিয়াসিস থেকে হাইড্রোসেফালাস হয়, অর্থাৎ মস্তিষ্কে পানি জমে। সেক্ষেত্রে শল্য চিকিৎসার প্রয়োজন হতে পারে। তবে, খুব কম ক্ষেত্রেই এমন ঘটে। সঠিকভাবে টিনিয়াসিসের চিকিৎসা করা না-হলে এ-রোগ বেশি জটিল আকার ধারণ করতে পারে এবং এই কৃমি মস্তিষ্ক, চোখ বা হৃদপিণ্ডের ক্ষতি করতে পারে। এছাড়াও, টিনিয়াসিসের কারণে অন্ত্রে প্রতিবন্ধকতারও সৃষ্টি হতে পারে।

ছয়মাস পরপর সবার কৃমির ওষুধ খাওয়া উচিত। তা না-হলে বিভিন্ন সমস্যার সম্মুখীন হতে হয়। টিনিয়াসিস সহজেই প্রতিরোধ করা যায়। তবে, আক্রান্ত ব্যক্তির দ্রুত রোগ নির্ণয় এবং চিকিৎসা করাতে পারলে সে নিজে দ্রুত সেরে উঠবে এবং অসুখটিও আর ছড়াতে পারবে না। মাংস রান্না করার সময় ভালোভাবে সিদ্ধ করতে হবে। অসিদ্ধ বা অর্ধসিদ্ধ মাংস খাওয়া যাবে না। রাস্তাঘাটে মাংস খাওয়ার ব্যাপারে সতর্ক হতে হবে। খাবার আগে ভালোভাবে হাত ধু'তে হবে। স্যানিটারি ল্যাট্রিন বা স্বাস্থ্যকর পায়খানা ব্যবহার করলে কৃমির ডিম সহজে পরিবেশে ছড়াতে পারে না। বসতবাড়ির পরিবেশ এবং জীবনযাত্রার মান উন্নয়নের মাধ্যমে টিনিয়াসিস অনেকাংশেই প্রতিরোধ করা যায়। সবার সচেতনতাই এ-রোগ প্রতিরোধের প্রধান হাতিয়ার। ■

চোখে অঞ্জনি হলে এবং চোখ উঠলে কী করবেন

ডাঃ রীনা দাস, আইসিডিডিআর,বি

আমাদের চোখ অত্যন্ত সংবেদনশীল একটি অঙ্গ। অনেকসময় চোখের ছোটখাটো সমস্যাও অবহেলার কারণে বিরাট ক্ষতির কারণ হয়ে দাঁড়াতে পারে। চোখে অঞ্জনি হওয়া এবং চোখ-ওঠা আমাদের দেশে খুব বেশি দেখা যায়। গবেষণায় দেখা গেছে, একজন মানুষ জীবনে ২-৩ বার চোখের অঞ্জনিতে আক্রান্ত হতে পারে।

অপরপক্ষে, সাধারণভাবে প্রচলিত কথা 'চোখ-ওঠা' বলতে চোখ লাল হয়ে জ্বালা-যন্ত্রণা হওয়াকে বুঝায় কিন্তু চোখ লাল-হওয়া একটি উপসর্গ মাত্র। চোখ-ওঠা বা কনজাংকটিভাইটিস (conjunctivitis) রোগের ফলে চোখ লাল হয়ে-যাওয়া, চোখ জ্বালা-করা, চোখে বালুর মতো কিছু পড়েছে বলে মনে-হওয়া, চোখ দিয়ে পানি-পড়া, চোখের কোণে পিঁচুটি জমা, চোখে চুলকানি হওয়া, চোখের পাতা ফুলে-যাওয়া, আলোর দিকে তাকাতে সমস্যা-হওয়া এবং দৃষ্টি ঝাপসা হয়ে-যাওয়ার মতো বিভিন্ন সমস্যা দেখা দেয়। এই রোগটি সাধারণত এক চোখে শুরু হয় এবং পরে দুই চোখই আক্রান্ত হতে পারে। ব্যাকটেরিয়া বা ভাইরাসের আক্রমণ অথবা অ্যালার্জিসহ বেশ কয়েকটি কারণে চোখ উঠতে পারে। ব্যাকটেরিয়া বা ভাইরাসজনিত চোখ-ওঠা রোগ সাধারণত ছোঁয়াচে হয়ে থাকে।

চোখের অঞ্জনি

চোখের পাপড়ি যেখান থেকে বের হয় সেই রেখা ঘেঁষে মাঝেমধ্যে যে লাল ছোট্ট দানার মতো তৈরি হয় তাকে চলতি কথায় অঞ্জনি বলে। চিকিৎসাবিজ্ঞানের ভাষায় একে বলে স্টাই (stye) বা হরডিওলাম (internal and external hordeolum)। চোখের পাপড়ির গোড়ার প্রান্তের ফলিকল এবং চোখের আর্দ্রতা রক্ষাকারী মেবোমিয়ান গ্রন্থিতে পুঁজ সৃষ্টিকারী সংক্রমণই অঞ্জনি। এই গ্রন্থির মুখ বন্ধ হয়ে গিয়ে ভেতরে ময়লা জমা হয় এবং প্রদাহের ফলে এই সমস্যার সৃষ্টি হয়। কখনো অন্যান্য গ্রন্থিও আক্রান্ত হতে পারে। এই দানাটি লাল হয়ে ফুলে যায় ও ব্যথা হয় এবং পরে সাদা পুঁজবিন্দু দেখা দিতে পারে। অঞ্জনির সঙ্গে চোখের পাপড়িরও প্রদাহ থাকতে পারে। প্রদাহের কারণ হিসাবে *স্ট্যাফাইলোকক্কাস* জীবাণুকে দায়ী করা হয়। বেশিরভাগ ক্ষেত্রে চোখের উপরের পাতায় অঞ্জনি হয়। তবে, নিচের পাতায়ও এটি হতে পারে। চোখের অঞ্জনি ছোঁয়াচে রোগ নয়।

চোখের অঞ্জনির লক্ষণ ও উপসর্গ

- চোখের পাতা ভারী-ভারী লাগা
- আক্রান্ত স্থান লাল হয়ে ফুলে-ওঠা এবং শক্ত হয়ে-যাওয়া
- পুঁজ জমে আক্রান্ত স্থানে ব্যথা-হওয়া
- আক্রান্ত স্থানের তাপমাত্রা বেড়ে-যাওয়া
- চোখ চুলকানো
- চোখে দেখতে সমস্যা-হওয়া
- চোখের ভেতর কিছু আটকে আছে এরকম অনুভূতি হওয়া
- অনেকসময় জ্বর-জ্বর অনুভূত হতে পারে

এই অবস্থায় যা করণীয়

- চোখ চুলকানো থেকে বিরত থাকা
- এক টুকরো তুলো বা কাপড়ের কুণ্ডলি গরম পানিতে ভিজিয়ে ১০ মিনিট করে দিনে চারবার সেঁক দেওয়া যেতে পারে। বরিক পাউডার-মেশানো কুসুম-গরম পানিতে তুলো অথবা নরম কাপড় ভিজিয়ে তা চোখে লাগিয়ে ভাপ দেওয়া যেতে পারে। বরিক পাউডারের সেক খুব উপকারী, এটি জীবাণু দূর করতে সাহায্য করে
- ব্যথা বেশি থাকলে ১টা করে দিনে ৩ বার প্যারাসিটামলজাতীয় ওষুধ খাওয়া যেতে পারে
- যদি ৪-৫ দিনেও অঞ্জনি ভালো না-হয় তবে চোখের চিকিৎসকের পরামর্শ নিতে হবে এবং ১-২ সপ্তাহের মধ্যেও অঞ্জনি না-সারলে চিকিৎসকের পরামর্শ অনুযায়ী অ্যান্টিবায়োটিক ওষুধ খাওয়া লাগতে পারে
- বারবার অঞ্জনি হলে গ্রন্থির মুখে কোনো সমস্যা,

দীর্ঘদিন ধরে পাপড়ির প্রদাহ বা পাপড়িতে খুশকি আছে কি না তা দেখতে হবে। এক্ষেত্রে অবহেলা না-করে চিকিৎসকের পরামর্শ নিতে হবে

এছাড়াও নিম্নলিখিত কারণে চিকিৎসকের পরামর্শ নিতে হবে

- চোখে দেখতে সমস্যা হলে
- অঞ্জনির মুখে ফোস্কার মতো পড়লে এবং তা থেকে ঘা তৈরি হলে
- চোখের সাদা অংশ লাল হয়ে উঠলে
- চোখ থেকে রক্ত পড়লে
- চোখে অসহ্য ব্যথা হলে

চোখে অঞ্জনি হলে যা করা যাবে না

- চোখের পাতা অযথা ডলাডলি করা যাবে না
- নিজে সূঁচ বা ধারালো কিছু দিয়ে অঞ্জনি গলানো একদমই ঠিক নয়, কারণ এতে সংক্রমণের প্রবল সম্ভাবনা থাকে

বেশিরভাগ ক্ষেত্রে অঞ্জনি নিজে থেকেই সেরে যায় এবং ভেতরের ময়লা বের হয়ে আসে। সাধারণত ১-২ সপ্তাহের মধ্যে অঞ্জনি ভালো হয়ে যায়। অঞ্জনির কারণে চোখে খুব বেশি জটিলতা দেখা দিলে কোনো কোনো সময় অপারেশনও লাগতে পারে, তবে সচরাচর এমন ঘটে না।

অঞ্জনি প্রতিরোধের উপায়

- নিয়মিত চোখ পরিষ্কার রাখতে হবে
- অঞ্জনি হওয়ার পর চোখে ময়লা বা পিঁচুটি থাকলে তা পরিষ্কার করতে হবে
- চোখে হাত দিয়ে চোখ পরিষ্কার করার আগে হাত ভালো করে সাবান দিয়ে ধুয়ে নিতে হবে

চোখ-ওঠা

চোখ-ওঠা বা কনজাংকটিভাইটিস হলো ভাইরাস বা ব্যাকটেরিয়াজনিত সংক্রমণ। এডেনোভাইরাস বা হারপিস সিমপ্লেক্স ভাইরাসের আক্রমণে অথবা চোখের স্ক্লেরা নামের অংশের প্রদাহের কারণে এ-রোগ দেখা দেয়।

চোখ-ওঠা কীভাবে ছড়িয়ে পড়ে

সরাসরি হাতের স্পর্শ, বাতাস, এমনকি হাত-মুখ ধোয়া ও অজু-গোসলের সময় পুকুর, নদী বা সুইমিংপুলের পানির মাধ্যমেও জীবাণু ছড়াতে পারে। কনজাংকটিভাইটিসে আক্রান্ত চোখে আঙুল বা হাত লাগালে হাতে লেগে-থাকা জীবাণু রুমাল, তোয়ালে, গামছা, টিস্যু পেপার, কলম, পেন্সিল, বইয়ের পাতা, খাতা, টেবিল, চেয়ার, দরজার সিটকিনি, পানির কল প্রভৃতিতে

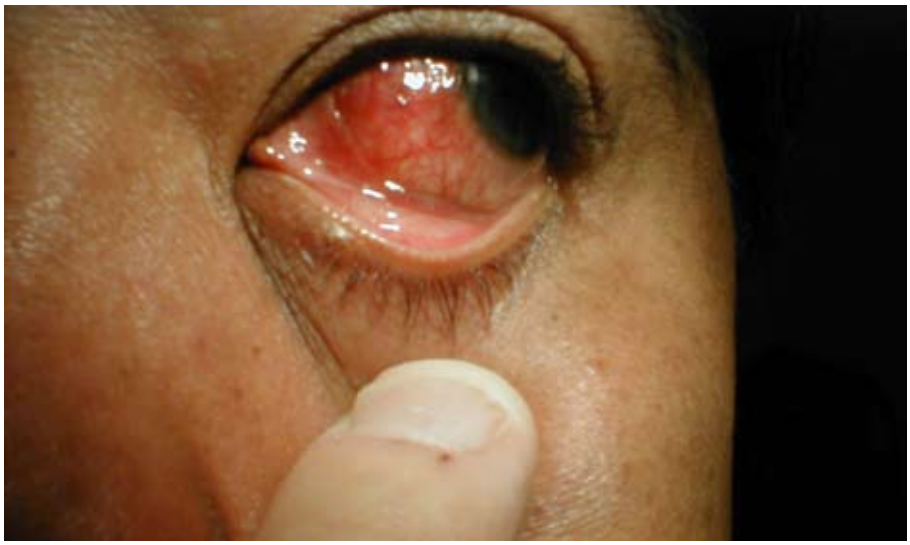

লেগে থাকতে পারে। কোনো বস্তু এভাবে জীবাণু বহন করলে চিকিৎসাবিজ্ঞানের পরিভাষায় তাকে বলে ফোমাইট। রুমাল, তোয়ালে বা টিস্যু পেপার দিয়ে আক্রান্ত চোখ মুছলে এগুলোতে জীবাণু লেগে থাকে এবং এসব ফোমাইটের মাধ্যমে জীবাণু অন্যের চোখে ছড়িয়ে যেতে পারে। এভাবে একজনের চোখ উঠলে তা দ্রুত অন্যদের মধ্যেও ছড়িয়ে পড়ে। স্কুল বা অন্যান্য শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের শিক্ষার্থীরা অনেকে একসঙ্গে থাকে বলে তাদের একজনের চোখ উঠলে খুব সহজেই রোগটি অন্যদের মধ্যে ছড়িয়ে পড়ে। ব্যাকটেরিয়াজনিত কারণে চোখ উঠলে লক্ষণ প্রকাশ পাওয়ার পর থেকে শুরু করে ৭-৮ দিন বা চিকিৎসা শুরু করার পর ২-৩ দিন পর্যন্ত এ-রোগ অন্যদের মধ্যে ছড়িয়ে পড়তে পারে আর ভাইরাসজনিত কারণে এ-রোগ হলে রোগের লক্ষণ প্রকাশ পাওয়ার আগে থেকে শুরু করে লক্ষণ প্রকাশ পাওয়ার পর ৭ থেকে ১০ দিন পর্যন্ত ভাইরাস অন্যদের মধ্যে ছড়াতে পারে। একে বলা হয় সংক্রমণের সময়কাল। শরীরে জীবাণু প্রবেশ করার ৫-৭ দিন পর চোখ-ওঠার লক্ষণ প্রকাশ পায়। কিছু ব্যতিক্রম ছাড়া কনজাংকটিভাইটিস তেমন কোনো জটিল রোগ নয়। সাধারণত ৭ থেকে ১০ দিনের মধ্যে এ-রোগ ভালো হয়ে যায়।

চোখ-ওঠার লক্ষণ ও উপসর্গ

- চোখ লাল হয়ে ফুলে ওঠে
- চোখে জ্বালাপোড়া হতে পারে, চোখের ভেতর অস্বস্তি বোধ হয় এবং ব্যথা হয়
- রোদে বা প্রখর আলোতে তাকাতে কষ্ট হয় এবং চোখ থেকে অতিমাত্রায় পানি পড়ে
- ঘুম থেকে ওঠার পর চোখের পাতা দু'টি একসাথে লেগে থাকে
- চোখ থেকে শ্লেষ্মাজাতীয় পদার্থ বের হতে থাকে এবং অনেকসময় হলুদ রঙের পুঁজ সৃষ্টি হয়
- সাধারণত ৭-৮ দিনের মধ্যে উপসর্গগুলো কমে আসে কিন্তু দৃষ্টি ঝাপসা হয়ে থাকতে পারে

- অনেকসময় মণি বা কর্নিয়াতে সাদা দাগ পড়ে, যা খালি চোখে দেখে বোঝা যায় না

চোখ-ওঠা রোগের প্রকারভেদ

১. ব্যাকটেরিয়ার দ্বারা প্রদাহ সৃষ্টি হলে চোখ থেকে পুঁজের মতো ঘন পদার্থ নিঃসৃত হয় এবং সকালে ঘুম থেকে ওঠার পর চোখের পাপড়িগুলো শক্ত এবং জড়সড় হয়ে আটকে থাকে

২. ভাইরাসের দ্বারা প্রদাহ সৃষ্টি হলে চোখ থেকে পানির মতো ঘন পদার্থ বের হয় এবং প্রায়শই যেকোনো একটি চোখ থেকে এরকম নিঃসরণ ঘটে এবং মাঝেমধ্যে চোখের দুই পাতা যুক্ত হয়ে যায়

৩. অ্যালার্জির কারণে প্রদাহ সৃষ্টি হলে, চোখের চারপাশের ত্বক ফুলে ওঠে, চোখ ভীষণ চুলকায়, চোখে জ্বালাপোড়া হয় এবং পানি পড়তে থাকে, নাক দিয়েও পানি পড়ে এবং প্রচুর হাঁচি হয়

চোখ উঠলে করণীয়

- আক্রান্ত চোখের যন্ত্রণা উপশমের উদ্দেশ্যে একটি পরিষ্কার, উষ্ণ এবং হালকা ভেজা কাপড় দিয়ে খানিকক্ষণ পরপর চেপে ধরে রাখা যেতে পারে। সংক্রমণ প্রতিরোধের জন্য ব্যবহারের পর কাপড়টি গরম পানি এবং ডিটারজেন্ট দিয়ে ধুয়ে ফেলতে হবে
- কোনো শিক্ষার্থীর চোখ উঠলে তার বাসায় থাকা উচিত। এতে শিক্ষক-শিক্ষিকা এবং সহপাঠীদের মধ্যে সংক্রমণ ছড়ানোর সম্ভাবনা থাকে না
- কালো চশমা ব্যবহার করলে চোখে কিছুটা আরাম বোধ করা যায়
- আক্রান্ত চোখের যন্ত্রণা উপশমের উদ্দেশ্যে ওষুধের দোকান থেকে কৃত্রিম টিয়ারড্রপ কিনে ব্যবহার করা যেতে পারে। আক্রান্ত চোখে বেশি চুলকালে তা থেকে নিস্কৃতি পেতে একটি ভেজা, ঠাণ্ডা কাপড় দিয়ে চোখ পরিষ্কার করা উচিত
- চিকিৎসকের পরামর্শ অনুযায়ী অ্যান্টিবায়োটিক আইড্রপ ব্যবহার করা যেতে পারে
- অ্যান্টি-অ্যালার্জিক আইড্রপ ব্যবহার করে এবং অ্যান্টিহিস্টামিনজাতীয় ওষুধ খেয়ে চোখের চুলকানি ও লালচে ভাব কমানো যেতে পারে

যা করা উচিত নয়

- কোনো রেজিস্টার্ড চিকিৎসকের পরামর্শ ছাড়া ওষুধ ব্যবহার করা যাবে না
- চোখ বেশি ডলাডলি করা যাবে না
- শিশুদের ক্ষেত্রে জোর করে চোখ খুলতে বলা যাবে না। ভেজা পরিষ্কার কাপড় দিয়ে আস্তে আস্তে চোখ পরিষ্কার করলে চোখ খুলে যাবে

কখন চিকিৎসকের শরণাপন্ন হবেন

- প্রদাহ যদি দৃষ্টিশক্তিকে প্রভাবিত করে কিংবা তীব্র ব্যথা হয় বা অতিরিক্ত তরল পদার্থ নির্গত হয়
- নিজে নিজে একসপ্তাহ যাবৎ পরিচর্যা করার পরও যদি অবস্থা দিন দিন খারাপ হতে থাকে
- ঘনঘন এই রোগে আক্রান্ত হলে
- যদি এই প্রদাহের লক্ষণগুলোর পেছনে সংক্রামক ঘা, ঠাণ্ডা লাগা বা অ্যালার্জির কোনো প্রভাব নেই বলে মনে হয়
- যদি উজ্জ্বল আলোতে চোখে অস্বস্তি বোধ হয় এবং চোখ লাল হয়ে ওঠে কিংবা দৃষ্টি অস্পষ্ট হয়ে ওঠে তাহলেও চিকিৎসকের শরণাপন্ন হতে হবে, কারণ তা ধীরে ধীরে দৃষ্টিশক্তি লোপ পাওয়ার বা গ্লুকোমার লক্ষণ হতে পারে

নবজাতক ও ছোট শিশুদের চোখ উঠলে যা করা দরকার

- হালকা কুসুম-গরম পানি দিয়ে চোখ পরিষ্কার রাখতে হবে
- একটু বুঝতে শিখেছে এমন শিশুদেরকে কালো চশমা পরিয়ে রাখা যেতে পারে
- শিশুকে যতটা সম্ভব ঘরের ভেতরে রাখতে পারলে ভালো, কারণ বাইরের ধুলোবালি শিশুর চোখের অবস্থার অবনতি ঘটাতে পারে

কখন শিশুকে চিকিৎসকের কাছে নিতে হবে

- শিশুর বয়স ২ মাসের কম হলে এবং শিশুর চোখ থেকে ঘন হলুদ বা সবুজাভ হলুদ রঙের তরল পদার্থ বের হলে
- শিশু বারবার চোখব্যথার কথা বললে
- শিশুর দেখতে অসুবিধা হলে
- শিশুর চোখের আকৃতিতে বিশেষ কোনো অস্বাভাবিকতা দেখা দিলে
- চোখের পাতা অতিরিক্ত ফুলে উঠলে কিংবা লাল হয়ে গেলে

নবজাতকের চোখ-ওঠা একটি বিশেষ সমস্যা, তাই এক্ষেত্রে বেশি সতর্কতা অবলম্বন করা প্রয়োজন। ওষুধপত্র দিলেও নবজাতকের চোখ ২-৩ দিন লাল অথবা ফোলা থাকতে পারে। যদি লালচে রঙ এবং ফোলা দীর্ঘসময় ধরে থাকে তখন অবশ্যই দেরি না-করে চিকিৎসকের শরণাপন্ন হওয়া দরকার।

চোখ-ওঠার ফলে সৃষ্ট জটিলতা

কিছুকিছু ক্ষেত্রে চোখ-ওঠা থেকে অত্যন্ত ভয়াবহ পরিস্থিতির সৃষ্টি হতে পারে, যদিও এরকম অবস্থা খুব কমই ঘটে থাকে।

- চোখ-ওঠা থেকে কর্নিয়ায় ঘা হলে কর্নিয়া ছিদ্র হয়ে চোখ অন্ধ হয়ে যেতে পারে
- কর্নিয়া আক্রান্ত হয়ে কর্নিয়া ঝরে পড়তে পারে এবং তার ফলে পুরো চোখ নষ্ট হয়ে যেতে পারে
- চোখের পাতায় প্রদাহের ফলে পাতার স্থায়ী ক্ষতি হতে পারে
- চোখে গনোরিয়া সংক্রমণ দেখা দিলে কর্নিয়া ফুলে যেতে পারে, যা সেরে গিয়েও কর্নিয়া ঘোলাটে হয়ে যেতে পারে। এর ফলে দৃষ্টিশক্তি

নষ্ট হয়ে যেতে পারে বা চোখ ট্যারা হয়ে যেতে পারে

কীভাবে চোখ-ওঠা প্রতিরোধ করা যায়

১. অন্যের ব্যবহৃত চোখের প্রসাধনী এবং চোখের ড্রপ ব্যবহার করা যাবে না

২. অন্যের রুমাল, তোয়ালে বা মুখ মোছার কাপড় ব্যবহার করা যাবে না

৩. চোখ উঠলে নিজের চোখ স্পর্শ করে অন্যদেরকে সেই হাত দিয়ে স্পর্শ করা যাবে না। কিছুক্ষণ পরপর হাত ধুয়ে ফেলতে হবে

৫. অ্যালার্জি থাকলে অ্যালার্জি উদ্রেককারী বস্তু, যেমন পুস্পরেণু, ধুলা, ছত্রাকযুক্ত বস্তু, এবং লোমশ প্রাণীর সংস্পর্শ থেকে দূরে থাকা উচিত

৬. বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই চোখ-ওঠা বা কনজাংটিভাইটিস পরিবারের একজনের থেকে অন্যজনের হতে পারে। সুতরাং এসব ক্ষেত্রে রোগ প্রতিরোধের জন্য পরিবারের সবার পৃথক কাপড় ও তোয়ালে থাকতে হবে

বাংলাদেশে চোখ-ওঠা এবং চোখে অঞ্জনি হওয়া খুবই সাধারণ একটি সমস্যা। তবে, বেশিরভাগ মানুষই এই সমস্যাগুলোকে তেমন গুরুত্বের সাথে বিবেচনা করে না। এর ফলে এই গুরুত্বহীন সমস্যাও কোনো কোনো সময় মারাত্মক জটিল আকার ধারণ করতে পারে। তা যাতে না হয় সেজন্য চোখ উঠলে বা চোখে অঞ্জনি হলে উল্লেখিত নিয়মগুলো সঠিকভাবে পালন করা উচিত। চোখ নিয়মিত পরিষ্কার রাখা এবং সঠিক সময়ে চোখের রোগের চিকিৎসা করা বাঞ্ছনীয়, কারণ চোখ আমাদের এক অমূল্য সম্পদ। ■

নন-অ্যালকোহলিক ফ্যাটি লিভার ডিজিজ

ডাঃ শামসুল আরেফিন, আইসিডিডিআর,বি

এটি যকৃতের একটি অসুখ যা সাধারণত উচ্চবিত্ত শ্রেণীর মানুষের মধ্যে বেশি দেখা যায় এবং শরীরে অতিরিক্ত মেদের কারণে এ-রোগ হয়ে থাকে। উন্নত বিশ্বে ক্রনিক লিভার ডিজিজ বা দীর্ঘমেয়াদী যকৃতের রোগের কারণ হিসেবে হেপাটাইটিস বি, হেপাটাইটিস সি এবং অ্যালকোহলের পরেই এর অবস্থান। আমাদের দেশে অবশ্য যকৃতের দীর্ঘমেয়াদী সমস্যার জন্য অ্যালকোহলের চেয়ে এ-রোগটি বেশি দায়ী।

রোগটি দুই রকমের হতে পারে:

১. সাধারণ ফ্যাটি লিভার ডিজিজ (নন-অ্যালকোহলিক ফ্যাটি লিভার)

২. নন-অ্যালকোহলিক স্টিয়াটো হেপাটাইটিস (ন্যাস)

সাধারণ ফ্যাটি লিভার ডিজিজের পরিণতি সাধারণত খারাপ না-হলেও ন্যাস লিভার ফাইব্রোসিস, এমনকি সিরোসিস সৃষ্টি করতে পারে।

অনেকের মতে, নন-অ্যালকোহলিক ফ্যাটি লিভার ডিজিজ মেটাবলিক সিনড্রোম যথা হাইপার ট্রাইগ্লিসারাইডেমিয়া, উচ্চ রক্তচাপ, ডায়াবেটিস, স্থূলতা (বিএমআই ২৫-এর চেয়ে বেশি) প্রভৃতি যকৃতজনিত জটিলতা থেকে জন্ম নিতে পারে।

যারা নন-অ্যালকোহলিক ফ্যাটি লিভার ডিজিজে ভোগেন তাদের অধিকাংশের ক্ষেত্রে ইনসুলিন কাজ করে না, যদিও এদের সবার মধ্যে গ্লুকোজ অসহনীয়তা থাকে না।

নন-অ্যালকোহলিক ফ্যাটি লিভার ডিজিজে রক্তে যকৃতের এনজাইমগুলোর পরিমাণ বৃদ্ধি পায়। বেশিরভাগ মানুষেরই কোনো লক্ষণ প্রকাশ পায় না। অনেকে সিরোসিসের জটিলতা, যেমন

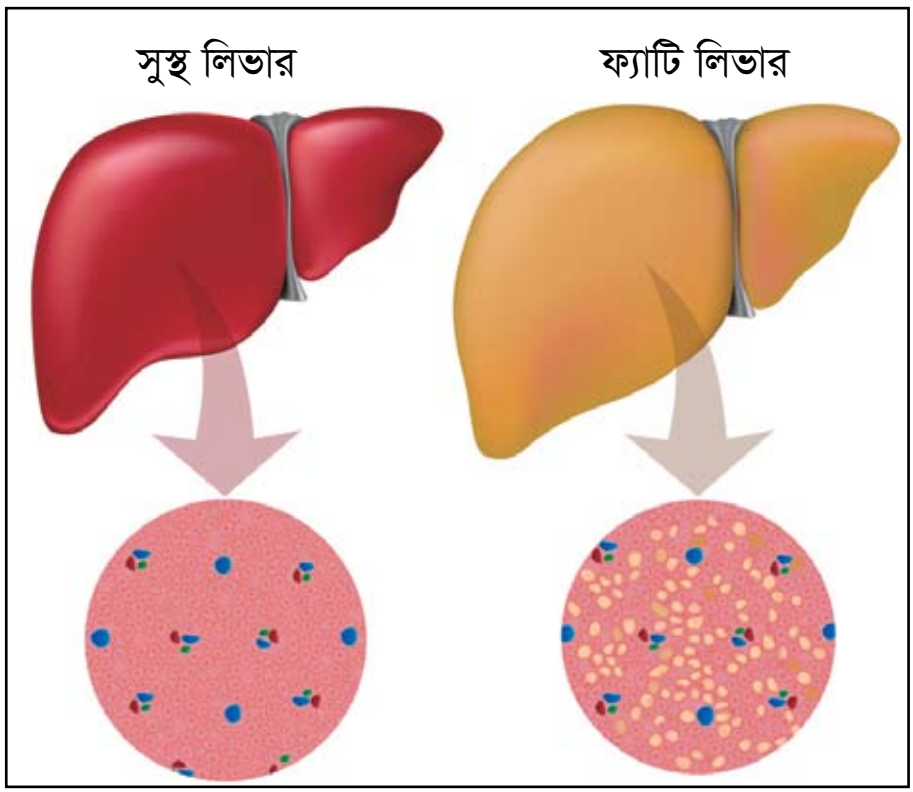

রক্তবমি, পায়খানার সাথে রক্ত-যাওয়ার কারণে অথবা যকৃতের ক্যান্সার নিয়ে চিকিৎসার জন্য আসেন। জন্ডিসের লক্ষণ সাধারণত দেখা যায় না। তবে, সিরোসিস হলে জন্ডিসও দেখা দিতে পারে।

এখন পর্যন্ত এ-রোগের যেসব চিকিৎসা পদ্ধতি ব্যবহৃত হয়ে আসছে সেগুলোর প্রধান লক্ষ্য হলো ওজন হ্রাস করা এবং ইনসুলিন প্রতিরোধজনিত সমস্যা দূর করা। এসব ক্ষেত্রে যকৃতের কার্যক্ষমতার উন্নতির জন্য মেটফরমিন ব্যবহার করা যেতে পারে। এছাড়াও, যেসব ডায়াবেটিক রোগীর নন-অ্যালকোহলিক ফ্যাটি লিভার ডিজিজ আছে তাদের জন্য মেটফরমিন ব্যবহার করা যেতে পারে। মেটফরমিন ছাড়াও পায়োগ্লিটাজোন ব্যবহার করা যেতে পারে।

ওজন হ্রাসের ফলে যকৃতের কার্যক্ষমতা বেড়ে যায় এবং ইনসুলিন প্রতিরোধ-সংক্রান্ত অবস্থারও উন্নতি হয়। এক্ষেত্রে স্ট্যাটিনজাতীয় ওষুধগুলোর কোনো ভূমিকা নেই। তবে, হাইপারলিপিডেমিয়ার জন্য এগুলো ব্যবহার করা যেতে পারে।

ওজন কমান, সুস্থ থাকুন। ■

স্বাস্থ্য সংলাপে লেখা আহ্বান

যেকেউ স্বাস্থ্য সংলাপে লেখা দিতে পারেন। স্বাস্থ্যসম্পর্কিত যেকোনো মানসম্মত লেখা আমরা স্বাস্থ্য সংলাপে ছাপাতে পারি। লেখা সম্পর্কে ধারণা নিতে http://www.icddrb.org/shasthyasanglap লিংকটিতে স্বাস্থ্য সংলাপের পূর্ববর্তী সংখ্যাগুলো দেখুন। লেখা পাঠাবার ঠিকানা: hasib@icddrb.org।